#RiseWithRICE

RICE IAS

প্রত্যাশিত

EDITORIAL EXPLAINED

for

IAS মেইনস পরীক্ষা

23rd to 28th Feb 2026

সূচক

1. **সাধারণ স্টাডিজ ২** 01
   - 1.1. রাজনীতি এবং শাসনব্যবস্থা 01
     - 1.1.1. সংসদের ঐতিহাসিক আইন: মহিলাদের জন্য অপেক্ষার দীর্ঘ প্রহর 01
     - 1.1.2. ভারতের বিমান নিরাপত্তা ও অ-নির্ধারিত অপারেটর: চ্যালেঞ্জ এবং নিয়ন্ত্রণমূলক সংস্কার 03
   - 1.2. সামাজিক ন্যায়বিচার 06
     - 1.2.1. আদিবাসী নারীদের উত্তরাধিকার অধিকারের পুনর্মূল্যায়ন 06
   - 1.3. আন্তর্জাতিক সম্পর্ক 09
     - 1.3.1. ভারত-ইসরায়েল কৌশলগত অংশীদারিত্ব 09
2. **সাধারণ স্টাডিজ ৩** 13
   - 2.1. অর্থনীতি 13
     - 2.1.1. ভারতের ক্রিটিক্যাল মিনারেলস স্ট্র্যাটেজি: নীতিগত পরিবর্তন থেকে কৌশলগত মূলধারা পর্যন্ত 13
   - 2.2. পরিবেশ 17
     - 2.2.1. ভারতে বোতলজাত জলের নিরাপত্তার ভ্রান্ত ধারণা এবং প্রকৃত সত্য 17

***

Scan to know more about our courses...

IAS 2-Year GS PCM | IAS 10-Month GS PCM | Degree + IAS | Prelims Test Series

সাধারণ স্টাডিজ ২

1.1. রাজনীতি এবং শাসনব্যবস্থা

1.1.1. সংসদের ঐতিহাসিক আইন: মহিলাদের জন্য অপেক্ষার দীর্ঘ প্রহর

প্রেক্ষাপট

- **সংবিধান (১০৬তম সংশোধনী) আইন, ২০২৩**, যা **'নারী শক্তি বন্দন অধিনিয়ম'** নামে পরিচিত, সেপ্টেম্বর ২০২৩-এ পাস হয়। এর লক্ষ্য লোকসভা, রাজ্য বিধানসভা এবং দিল্লি বিধানসভায় মহিলাদের জন্য এক-তৃতীয়াংশ (**৩৩%**) আসন সংরক্ষণ করা।
- লিঙ্গসমতার ক্ষেত্রে এটি একটি মাইলফলক হিসেবে উদযাপিত হলেও, এই আইনটি কার্যকর প্রতিনিধিত্বকে অন্তত **২০৩৪** সাল পর্যন্ত পিছিয়ে দিয়েছে। এর ফলে একটি সাংবিধানিক প্রতিশ্রুতি একটি "স্থগিত বাস্তবে" পরিণত হয়েছে।

মহিলা সংরক্ষণ আইন, ২০২৩-এর প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ

1. **মহিলাদের জন্য সংরক্ষণ:** লোকসভা, রাজ্য বিধানসভা এবং দিল্লির বিধানসভায় মহিলাদের জন্য ৩৩% আসন সংরক্ষিত থাকবে। এর মধ্যে তফশিলি জাতি (SC) এবং তফশিলি জনজাতি (ST)-দের জন্য নির্ধারিত আসনের মধ্যেও এক-তৃতীয়াংশ মহিলাদের জন্য উপ-সংরক্ষণ থাকবে।
2. **সংরক্ষণ শুরু হওয়ার সময়:** এই আইনটি কার্যকর হওয়ার পর প্রথম যে **জনগণনা (Census)** হবে, তার রিপোর্ট প্রকাশের পরই এটি বাস্তবায়িত হবে। এরপর একটি **আসন বিন্যাস বা সীমানা পুনর্নির্ধারণ (Delimitation)** প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মহিলাদের জন্য নির্দিষ্ট আসন চিহ্নিত করা হবে। প্রাথমিকভাবে এই ব্যবস্থা ১৫ বছরের জন্য বলবৎ থাকবে।
3. **আসন আবর্তন (Rotation):** ভৌগোলিক ভারসাম্য বজায় রাখতে সংরক্ষিত আসনগুলি বিভিন্ন নির্বাচনী এলাকায় আবর্তিত হবে। প্রতিটি আসন বিন্যাস প্রক্রিয়ার পর এই আবর্তন প্রক্রিয়া সংসদীয় আইন অনুযায়ী পরিচালিত হবে।

বিলম্বের জন্য দায়ী সাংবিধানিক প্রক্রিয়া: আসন বিন্যাস (Delimitation)

- **আসন বিন্যাস কী:** জনসংখ্যার পরিবর্তনের ভিত্তিতে নির্বাচনী এলাকার সীমানা পুনর্নির্ধারণ করার প্রক্রিয়া, যাতে প্রতিটি আসন মোটামুটি সমান সংখ্যক মানুষের প্রতিনিধিত্ব করে।
- **দুটি ধারাবাহিক শর্ত:** সংরক্ষণ শুরু হওয়ার আগে দুটি ধাপ প্রয়োজন—১) **জাতীয় জনগণনা** (সম্ভাব্য ২০২৭) এবং ২) সংবিধানের ৮২ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতির অধীনে **আসন বিন্যাস কমিশন** গঠন। তথ্য যাচাই ও প্রকাশ করতে ১৮ মাস সময় লাগে, যা এই প্রক্রিয়াকে ২০২৯-এর দিকে ঠেলে দেয়।
- **জটিলতা:** ৫৪৩টি লোকসভা এবং ৪,০০০-এর বেশি বিধানসভা আসনের মধ্যে জনসংখ্যা সাম্য, ভৌগোলিক অবস্থান, প্রশাসনিক সীমানা এবং এসসি/এসটি কোটা বজায় রাখা অত্যন্ত সময়সাপেক্ষ। আগের কমিশনগুলির (১৯৫২, ১৯৬৩, ১৯৭৩, ২০০২) কাজ শেষ করতে ৩-৬ বছর সময় লেগেছিল; এবার তা ২০৩২-৩৩ সাল পর্যন্ত গড়াতে পারে।

এই নকশার পেছনের যুক্তি: সম্প্রসারণের মাধ্যমে সমন্বয়

সংরক্ষণকে আসন বিন্যাসের সাথে জুড়ে দেওয়ার পেছনে একটি রাজনৈতিক অঙ্ক কাজ করছে:

- **পুরুষ প্রতিনিধিদের স্থানচ্যুতি এড়ানো:** বর্তমান ৫৪৩টি আসনের মধ্যেই ৩৩% কোটা চালু করলে ১৮১ জন বর্তমান পুরুষ সদস্য আসন হারাতেন।

- **"বড় পাই" (Bigger Pie) কৌশল:** ২০২৬-এর পর আসন বিন্যাস হলে লোকসভার আসন সংখ্যা বেড়ে ৮০০ বা ৮৮৮ হতে পারে। আসন সংখ্যা বাড়িয়ে দিলে পুরুষদের সংখ্যা না কমিয়েই ৩৩% মহিলাকে জায়গা দেওয়া সম্ভব হবে।
- **ঐকমত্যের মূল্য:** যদিও এটি রাজনৈতিক সংঘাত কমায়, তবে এর ফলে মহিলাদের তাদের অধিকারের জন্য আরও এক দশক অপেক্ষা করতে হচ্ছে।

বর্তমান চিত্র (Representation Landscape)

- মহিলা প্রার্থীদের সংখ্যা ১৯৫৭ সালে ৩% থেকে বেড়ে ২০২৪ সালে ১০% হয়েছে, কিন্তু জয়লাভের হার থমকে আছে: লোকসভায় **১৪%**, রাজ্য বিধানসভায় গড়ে **৯%** এবং রাজ্যসভায় **১৭%**।
- বিশ্বজুড়ে এই গড় ২৬%; ভারত তার জি-২০ (G20) সমকক্ষ দেশগুলোর তুলনায় পিছিয়ে আছে।

মূল চ্যালেঞ্জ এবং কাঠামোগত বাধা

১. মহিলাদের বর্জনের পাঁচটি স্তম্ভ

- **পিতৃতান্ত্রিক মানসিকতা:** সমাজ মহিলাদের গৃহবধূ হিসেবেই দেখতে অভ্যস্ত। পঞ্চায়েতে নির্বাচিত মহিলারা অনেক সময় তাদের স্বামীদের প্রক্সি হিসেবে কাজ করেন (সরপঞ্চ পতি)।
- **"জেতার ক্ষমতা" (Winnability) ট্র্যাপ:** রাজনৈতিক দলগুলো মনে করে মহিলারা পুরুষদের তুলনায় কম 'জেতার যোগ্য', তাই তারা মহিলাদের ১০ শতাংশের কম টিকিট দেয়।
- **"টাকা এবং পেশীশক্তি" (Money and Muscle):** মিলন বৈষ্ণবের মতে, ভারতীয় রাজনীতি চলে টাকা ও পেশীশক্তিতে। মহিলারা সাধারণত পারিবারিক সম্পদের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখেন না এবং অপরাধী চক্রের সাথেও যুক্ত থাকেন না, ফলে তারা পিছিয়ে পড়েন।
- **দ্বিগুণ বোঝা:** ঘরোয়া কাজ ও সন্তান পালনের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি রাজনীতিতে ২৪/৭ সময় দেওয়া মহিলাদের জন্য কঠিন হয়ে পড়ে।
- **বিষাক্ত রাজনৈতিক পরিবেশ:** মহিলা রাজনীতিবিদরা প্রায়ই লিঙ্গ বৈষম্যমূলক মন্তব্য এবং অনলাইন চরিত্রহননের শিকার হন।

২. ফেডারেল বা যুক্তরাষ্ট্রীয় উত্তেজনা

- দক্ষিণী রাজ্যগুলো, যারা সফলভাবে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করেছে, তারা ভয় পাচ্ছে যে আসন বিন্যাসের ফলে উত্তর ভারতের রাজ্যগুলোর তুলনায় তাদের আসন সংখ্যা কমে যাবে। এই রাজনৈতিক অচলাবস্থা কাটলে তবেই মহিলা সংরক্ষণ কার্যকর হওয়া সম্ভব।

৩. আইনের নকশাগত ত্রুটি

- **উচ্চকক্ষে অনুপস্থিতি:** এই আইন রাজ্যসভা বা বিধান পরিষদে প্রযোজ্য নয়।
- **ওবিসি (OBC) উপ-কোটার অভাব:** ওবিসি মহিলাদের জন্য কোনো আলাদা সংরক্ষণ নেই, যা শুধুমাত্র উচ্চবিত্ত বা অভিজাত মহিলাদের প্রবেশের সুযোগ করে দিতে পারে (Elite Capture)।

বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করার উপায়

- **সাংবিধানিক বিচ্ছেদ:** জনগণনা এবং আসন বিন্যাসের সাথে সংরক্ষণের বাধ্যতামূলক যোগসূত্রটি সরিয়ে ফেলা।
- **অনুচ্ছেদ ১৫(৩)-এর ব্যবহার:** সংবিধানে মহিলাদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করার যে ক্ষমতা রাষ্ট্রকে দেওয়া হয়েছে, তা ব্যবহার করে বর্তমান ৫৪৩টি আসনেই দ্রুত সংরক্ষণ কার্যকর করা।
- **অন্তর্বর্তী সম্প্রসারণ:** পূর্ণ আসন বিন্যাসের আগেই লোকসভায় মহিলাদের জন্য কিছু অতিরিক্ত আসন যোগ করা।
- **টিকিট সংরক্ষণ:** জনপ্রতিনিধিত্ব আইন, ১৯৫১ সংশোধন করে রাজনৈতিক দলগুলোর জন্য ৩৩% টিকিট মহিলাদের দেওয়া বাধ্যতামূলক করা।

উপসংহার

মহিলা সংরক্ষণ আইন একটি ঐতিহাসিক কিন্তু স্থগিত প্রতিশ্রুতি। পদ্ধতিগত জটিলতা যেন প্রতিনিধিত্বের অধিকারকে অস্বীকার করার হাতিয়ার না হয়ে ওঠে। সত্যিকারের গণতন্ত্র এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের জন্য ভারতের উচিত যুক্তরাষ্ট্রীয় সমস্যাগুলো মিটিয়ে ফেলা এবং দ্রুত এই সংরক্ষণ কার্যকর করা।

প্রশ্ন: *নারী শক্তি বন্দন অধিনিয়ম (মহিলা সংরক্ষণ আইন), ২০২৩-এর আলোকে ভারতে মহিলাদের কার্যকর রাজনৈতিক অংশগ্রহণের পথে কাঠামোগত, আর্থ-সামাজিক এবং প্রাতিষ্ঠানিক বাধাগুলি চিহ্নিত করুন। দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাগুলি পরামর্শ দিন। (২৫০ শব্দ)*

1.1.2. ভারতের বিমান নিরাপত্তা ও অ-নির্ধারিত অপারেটর: চ্যালেঞ্জ এবং নিয়ন্ত্রণমূলক সংস্কার

প্রেক্ষিত

- ২০২৬ সালের জানুয়ারিতে মহারাষ্ট্রের **বারামতিতে** ছোট বিমানের দুর্ঘটনা, ঝাড়খণ্ডের **সিমারিয়ার** কাছে দুর্ঘটনা এবং আন্দামানের **মায়াবন্দরের** কাছে একটি হেলিকপ্টারের জরুরি অবতরণসহ সাম্প্রতিক একাধিক বিমান দুর্ঘটনা ভারতের **অ-তফসিলি অপারেটর** (NSO) খাতে গভীর নিরাপত্তা উদ্বেগের সংকেত দিচ্ছে।
- এই ঘটনাগুলো জোর দিয়ে বলছে যে, চার্টার এভিয়েশন বা ভাড়ায় চালিত বিমান পরিষেবাকে তফশিলি বাণিজ্যিক ফ্লাইটের মতোই কঠোর নিয়মের আওতায় আনা প্রয়োজন, কারণ এই খাতের দ্রুত বৃদ্ধি তদারকির গুরুত্ব বাড়িয়ে দিয়েছে।

পটভূমি: ভারতে NSO-এর বর্তমান চিত্র

- **NSO-এর সংজ্ঞা:** অ-নির্ধারিত অপারেটর বা NSO হলো এমন সংস্থা যা কোনো পূর্বনির্ধারিত সময়সূচি ছাড়াই বিমান পরিবহন পরিষেবা (যাত্রী বা পণ্য) প্রদান করে। এগুলো মূলত 'চার্টার' বা ভাড়ার ভিত্তিতে পরিচালিত হয়।
- **বর্তমান পরিধি:** ২০২৫ সালের শেষ নাগাদ ভারতের প্রায় **১৩৩টি NSO পারমিটধারী সংস্থা** রয়েছে, যারা বিভিন্ন ধরণের ফিক্সড-উইং (স্থায়ী ডানাযুক্ত) বিমান এবং রোটারি-উইং (হেলিকপ্টার) ব্যবহার করছে।
- **বৃদ্ধির চালিকাশক্তি:** ভিআইপি (VIP) ভ্রমণ, ধর্মীয় পর্যটন (হেলিকপ্টারে তীর্থযাত্রা), জরুরি চিকিৎসা পরিষেবা (এয়ার অ্যাম্বুলেন্স) এবং কর্পোরেট লজিস্টিকসের চাহিদা বৃদ্ধির ফলে NSO খাতের বিস্তার ঘটছে। এই বিমানগুলো প্রায়শই এমন সব 'অনিয়ন্ত্রিত পরিবেশে' বা দুর্গম বিমানঘাঁটিতে চলাচল করে যেখানে সাধারণ বাণিজ্যিক এয়ারলাইনগুলো পৌঁছাতে পারে না।

ভারতের বিমান চলাচল শিল্পের বর্তমান চিত্র

- **বিশ্ব বাজারে অবস্থান :** মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং চীনের পর ভারত বর্তমানে বিশ্বের **তৃতীয় বৃহত্তম অভ্যন্তরীণ বিমান বাজার**। এটি বৈশ্বিক বিমান চলাচলের প্রায় **৪.২%** নিয়ন্ত্রণ করে। বর্তমানে বিশ্বের মোট বিমানের প্রায় **২.৪%** ভারতে রয়েছে, যা নতুন অর্ডারের মাধ্যমে দ্রুত বাড়ছে।
- **যাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধি :** ২০৩০ সালের মধ্যে অভ্যন্তরীণ আকাশপথের যাত্রী চাহিদা **৭১৫ মিলিয়নে** পৌঁছাবে বলে আশা করা হচ্ছে। ২০৪০ সালের মধ্যে এটি **১.১ বিলিয়নে** উন্নীত হতে পারে, যা বর্তমানের তুলনায় প্রায় ৬ গুণ বৃদ্ধি।
- **পরিকাঠামো বিস্তার :** ২০১৪ সালে কার্যকর বিমানবন্দরের সংখ্যা ছিল ৭৪টি, যা ২০২৫ সালে বেড়ে **১৬৩টিতে** দাঁড়িয়েছে। **২০৪৭ সালের মধ্যে ৩৫০-৪০০টি বিমানবন্দর** তৈরির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে, যেখানে গ্রিনফিল্ড প্রকল্প এবং **পিপিপি (PPP) মডেলকে** গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

- **অর্থনীতিতে অবদান:**২০২৫ সালের তথ্য অনুযায়ী, এই খাত প্রায় **৭.৭ মিলিয়ন কর্মসংস্থান** সৃষ্টি করেছে এবং ভারতের **জিডিপি-তে (GDP) প্রায় ১.৫%** অবদান রাখছে।
- **নিয়ন্ত্রণমূলক বিবর্তন**
  - **এয়ার কর্পোরেশন অ্যাক্ট, ১৯৫৩ (Air Corporations Act, 1953):** এই আইনের মাধ্যমে ৯টি বিমান সংস্থাকে **জাতীয়করণ** করা হয়েছিল, যার ফলে ১৯৯০-এর দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত সরকারি বিমান সংস্থাগুলোর একাধিপত্য ছিল।
  - **ওপেন স্কাই পলিসি (১৯৯০-৯৪):** এই নীতির মাধ্যমে ব্যক্তিগত 'এয়ার ট্যাক্সি' অপারেটরদের অনুমতি দেওয়া হয়, যা ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্স এবং এয়ার ইন্ডিয়ার **একচেটিয়া আধিপত্যের অবসান** ঘটায়।
- **ভারতীয় বায়ুযান অধিনিয়ম, ২০২৪ (Bharatiya Vayuyan Adhiniyam, 2024):** এটি ১৯৩৪ সালের পুরনো এয়ারক্রাফট অ্যাক্টকে প্রতিস্থাপন করেছে। এই আইনটি ভারতের বিমান চলাচল ব্যবস্থাকে ICAO **মানদণ্ড** এবং শিকাগো কনভেনশনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তুলেছে। এটি **'মেক ইন ইন্ডিয়া'** এবং **'আত্মনির্ভর ভারত'** অভিযানকে শক্তিশালী করে এবং লাইসেন্সিং প্রক্রিয়াকে সহজতর করে।

ভারতের বিমান চলাচল খাতের নিয়ন্ত্রণমূলক কাঠামো

- **নীতি নির্ধারণ ও কৌশলগত তদারকি (MoCA): বেসামরিক বিমান চলাচল মন্ত্রক (Ministry of Civil Aviation)** এই খাতের মূল চালিকাশক্তি। এটি **জাতীয় বেসামরিক বিমান চলাচল নীতি (NCAP)** তৈরি করে এবং UDAN-এর মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প ও বিমানবন্দর বেসরকারীকরণ তদারকি করে।
- **নিরাপত্তা ও অপারেশনাল নিয়ন্ত্রণ (DGCA): ডিরেক্টরেট জেনারেল অফ সিভিল এভিয়েশন (DGCA)** হলো প্রধান কারিগরি নিয়ন্ত্রক। এটি বিমানের ফিটনেস, পাইলটদের লাইসেন্স এবং **এয়ার অপারেটর সার্টিফিকেট (AOC)** প্রদান করে। এছাড়াও এটি নিরাপত্তা অডিট এবং **সিভিল এভিয়েশন রিকুইয়ারমেন্টস (CARs)** নির্ধারণ করে।
- **দুর্ঘটনা তদন্ত (AAIB): এয়ারক্রাফট অ্যাকসিডেন্ট ইনভেস্টিগেশন ব্যুরো (AAIB)** বিমান দুর্ঘটনা এবং গুরুতর ঘটনার তদন্ত করে। ICAO Annex 13 অনুসরণ করে এই সংস্থাটি দুর্ঘটনার কারণ চিহ্নিত করে এবং ভবিষ্যৎ প্রতিরোধের জন্য পরামর্শ দেয়।
- **পরিকাঠামো ও আকাশপথ ব্যবস্থাপনা (AAI): এয়ারপোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়া (AAI)** হলো একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা। এটি ভারতের আকাশপথ এবং বিমানবন্দরগুলোতে **এয়ার ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট (ATM)** এবং **কমিউনিকেশন নেভিগেশন সার্ভেইল্যান্স (CNS)** ব্যবস্থা পরিচালনা করে।
- **নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা (BCAS): ব্যুরো অফ সিভিল এভিয়েশন সিকিউরিটি (BCAS)** ১৯৮৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি যাত্রী স্ক্রিনিং, কার্গো সুরক্ষা এবং সন্ত্রাসবাদ বিরোধী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বিমানবন্দরের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। এর সদর দপ্তর নয়াদিল্লিতে এবং এটি আইপিএস (DGP) পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা দ্বারা পরিচালিত হয়।
- **প্রধান আইনী পদক্ষেপ:**
  - **ভারতীয় বায়ুযান অধিনিয়ম, ২০২৪:** এটি ১৯৩৪ সালের পুরনো আইনকে প্রতিস্থাপন করে লাইসেন্সিং প্রক্রিয়া সহজ করেছে এবং জরিমানা বৃদ্ধি করেছে।
  - **প্রোটেকশন অফ ইন্টারেস্ট ইন এয়ারক্রাফট অবজেক্টস অ্যাক্ট, ২০২৫:** এটি বিমান লিজ বা ভাড়ার ক্ষেত্রে আইনী জটিলতা কমিয়ে বিশ্বব্যাপী ঋণদাতাদের আস্থা বাড়িয়েছে।
- **আন্তর্জাতিক মানদণ্ড (ICAO):** ভারত **আন্তর্জাতিক বেসামরিক বিমান চলাচল সংস্থা (ICAO)**-এর সদস্য হিসেবে **শিকাগো কনভেনশন** এবং এর মানদণ্ড (SARPs) মেনে চলতে বাধ্য। এটি আন্তর্জাতিক বাজারে ভারতের সুনাম এবং বীমা খরচ নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

ভারতের বিমান চলাচল শিল্পের প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ

- **পাইলট প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতার অভাব:** ভারতে পর্যাপ্ত **ফ্লাইট সিমুলেটর** এবং যোগ্য ইনস্ট্রাক্টরের অভাব রয়েছে। প্রশিক্ষণ অত্যন্ত ব্যয়বহুল হওয়ায় পাইলট সরবরাহে ঘাটতি দেখা দেয়। এর ফলে ২০২৫ সালে প্রায় **২৩৬ জন অস্থায়ী বিদেশী পাইলট** নিয়োগ করতে হয়েছে, যা একটি ব্যয়বহুল ও স্বল্পমেয়াদী সমাধান।
- **বাজারের একাধিপত্য এবং পদ্ধতিগত ঝুঁকি:** ভারতের অভ্যন্তরীণ বাজারের প্রায় **৯০% যাত্রী পরিবহন** নিয়ন্ত্রণ করে মাত্র দুটি সংস্থা— **ইন্ডিগো** (IndiGo) এবং **এয়ার ইন্ডিয়া গ্রুপ**। এর মধ্যে ইন্ডিগো একাই ৬০% রুটে একমাত্র পরিষেবা প্রদানকারী। ফলে এই সংস্থাগুলোর পরিচালনায় কোনও বিঘ্ন ঘটলে পুরো আকাশপথের সংযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ার ঝুঁকি থাকে।
- **অপর্যাপ্ত অপারেশনাল বাফার:** বিশ্বজুড়ে বিমান সংস্থাগুলো সাধারণত ২০-২৫% অতিরিক্ত (স্ট্যান্ডবাই) ক্রু সদস্য রাখে। কিন্তু ভারতীয় এয়ারলাইনগুলো তাদের পূর্ণ সক্ষমতা ব্যবহার করে কাজ করায় হঠাৎ কোনও গোলযোগ বা কর্মী সংকট দেখা দিলে তা সামাল দেওয়ার মতো **অতিরিক্ত কর্মী** (Buffer) থাকে না।
- **নিয়ন্ত্রণমূলক দুর্বলতা:** বিমান চলাচল নিয়ন্ত্রক সংস্থা DGCA-এর অনুমোদিত কারিগরি পদগুলোর প্রায় অর্ধেকই শূন্য। পর্যাপ্ত কর্মীর অভাবে তদারকি ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়েছে। অনেক সময় কঠোর নিয়ম প্রয়োগের বদলে অস্থায়ীভাবে সময়সূচি শিথিল করে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা হয়, যা দীর্ঘমেয়াদে ঝুঁকির কারণ।
- **উচ্চ খরচ এবং জ্বালানি তেলের দামের ওঠানামা: এভিয়েশন টারবাইন ফুয়েল** (ATF) বা বিমানের জ্বালানির দাম বিশ্ববাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম এবং ডলারের হারের ওপর নির্ভরশীল। জ্বালানির এই অনিশ্চিত দাম এয়ারলাইনগুলোর ওপর বিশাল আর্থিক চাপ সৃষ্টি করে।
- **ঘন ঘন বিমান সংস্থা দেউলিয়া হওয়া:** ২০১২ সালে কিংফিশার এয়ারলাইন্স, ২০১৯ সালে জেট এয়ারওয়েজ এবং ২০২৩ সালে **গো ফার্স্ট** (Go First)-এর মতো বড় সংস্থাগুলোর পতন এই খাতের কাঠামোগত দুর্বলতা এবং আর্থিক অস্থিরতাকে স্পষ্টভাবে ফুটিয়ে তোলে।
- **নিরাপত্তা এবং কমপ্লায়েন্স ঝুঁকি:** আকাশপথে ট্রাফিক বৃদ্ধি এবং বারবার যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে নিরাপত্তা উদ্বেগ বাড়ছে। ২০২৫ সালে DGCA কর্তৃক **১৯টি নিরাপত্তা লঙ্ঘনের নোটিশ** জারি করা হয়েছে, যা এই খাতের নিয়ম পালনের ক্ষেত্রে ঘাটতিগুলো চিহ্নিত করে।

ভারতের বিমান চলাচল খাতকে শক্তিশালী করার মূল কৌশল

- **দীর্ঘমেয়াদী সংস্কারের ওপর জোর:** সাময়িক সমাধান বা ফ্লাইটের সময়সূচি বারবার পরিবর্তনের বদলে একটি শক্তিশালী প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো তৈরি করতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে যেন ২০৩০ সালের মধ্যে প্রত্যাশিত **৭১৫ মিলিয়ন যাত্রীর** চাপ আমাদের আকাশপথ ব্যবস্থা সামলাতে পারে।
- **নিয়ন্ত্রণমূলক তদারকি বাড়ানো:** নিয়ন্ত্রক সংস্থা DGCA-এর খালি থাকা কারিগরি পদগুলোতে দ্রুত নিয়োগ দিতে হবে। নিয়মতান্ত্রিক এবং ঝুঁকি-ভিত্তিক নজরদারি বাড়ানোর মাধ্যমে নিরাপত্তার মান উন্নত করতে হবে এবং বিশ্বজুড়ে ভারতের সুনাম বজায় রাখতে হবে।
- **উন্নত পাইলট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র তৈরি:** দেশের ভেতরেই পর্যাপ্ত **সিমুলেটর** এবং প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে। লাইসেন্স পাওয়ার পদ্ধতি সহজ করে এবং অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণে জোর দিয়ে বিদেশী পাইলটদের ওপর নির্ভরতা কমাতে হবে।
- **ক্রু মেম্বারদের রিজার্ভ রাখা:** আন্তর্জাতিক মানের সাথে তাল মিলিয়ে অন্তত **২০–২৫% অতিরিক্ত কর্মী** (Spare Crew) রাখার নিয়ম বাধ্যতামূলক করতে হবে। এর ফলে ব্যস্ত সময়ে বা হঠাৎ কর্মী সংকট দেখা দিলে ফ্লাইট চলাচল ব্যাহত হবে না।
- **আঞ্চলিক বিমান সংস্থাগুলোকে উৎসাহিত করা:** শুধুমাত্র লাইসেন্স বা NOC দিলেই হবে না, UDAN প্রকল্পের আওতায় ছোট বিমান সংস্থাগুলোকে সঠিক ভর্তুকি এবং বড় বিমানবন্দরগুলোতে নির্দিষ্ট 'স্লট' দিতে হবে। এতে বড় সংস্থাগুলোর ওপর একক নির্ভরতা কমবে।

- **জ্বালানি নীতি সংশোধন:** বিমানের জ্বালানির (ATF) ওপর ট্যাক্স কমানোর কথা ভাবতে হবে। বিশ্ববাজারে তেলের দামের ওঠানামা থেকে বাঁচতে সঠিক আর্থিক কৌশল (Fuel Hedging) গ্রহণ করতে হবে।

উপসংহার

ভারতের দ্রুত বর্ধনশীল বিমান চলাচল খাতকে নিরাপদ রাখতে হলে সরকারকে শুধুমাত্র নীতি তৈরির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না। বিশেষ করে ক্রমবর্ধমান অ-তফসিলি (Charter) খাতে নিরাপত্তা লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে **'জিরো-টলারেন্স' বা শূন্য-সহনশীলতা** নীতি গ্রহণ করতে হবে। পরিশেষে, বাণিজ্যিক স্বার্থের চেয়ে নিরাপত্তাকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া, স্বচ্ছ তদারকি এবং উন্নত পাইলট প্রশিক্ষণের মাধ্যমেই এই খাতের প্রকৃত সাফল্য নিশ্চিত করা সম্ভব।

প্রশ্ন: *ভারতের অ-নির্ধারিত অপারেটর (NSO) খাতে একাধিক দুর্ঘটনা ঘটেছে, যা পদ্ধতিগত নিরাপত্তা এবং নিয়ন্ত্রণমূলক ঘাটতিগুলিকে সামনে এনেছে। ভারতের বিমান শিল্পের মুখোমুখি হওয়া প্রধান সমস্যাগুলি সমালোচনামূলকভাবে পরীক্ষা করুন এবং নিয়ন্ত্রণমূলক তদারকি ও আঞ্চলিক সংযোগ শক্তিশালী করার কৌশল প্রস্তাব করুন। ১৫ নম্বর (GS-2, শাসনব্যবস্থা)*

1.2. সামাজিক ন্যায়বিচার

1.2.1. আদিবাসী নারীদের উত্তরাধিকার অধিকারের পুনর্মূল্যায়ন

প্রেক্ষাপট

- আদিবাসী সম্প্রদায়ের **নারীদের উত্তরাধিকার অধিকারের** বিষয়টি এখনও অমীমাংসিত রয়ে গেছে। অধিকাংশ **আদিবাসী প্রথাগত আইন** নারীদের সম্পত্তির ওপর নিরঙ্কুশ অধিকার প্রদান করে না।
- তাছাড়া, **হিন্দু উত্তরাধিকার আইন, ১৯৫৬**, যা কন্যাদের পৈতৃক সম্পত্তিতে সমান অধিকার দেয়, সেটি **তফসিলি উপজাতিদের** (Scheduled Tribes) ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। এর ফলে আদিবাসী নারীরা এই আইনের সুরক্ষা থেকে বঞ্চিত হন।
- তবে সাম্প্রতিককালে, **ভারতের** সুপ্রিম কোর্ট বিভিন্ন মামলায় দ্বিধা বিভক্ত অবস্থান নিয়েছে। কখনও **'হিন্দুকরণ'** (Hinduisation)-এর ভিত্তিতে অধিকার দেওয়া হয়েছে, আবার কখনও **সংবিধিবদ্ধ ছাড়ের** (Statutory Exemptions) দোহাই দিয়ে অধিকার অস্বীকার করা হয়েছে।

প্রেক্ষাপট: হিন্দু উত্তরাধিকার আইন ও আদিবাসী বঞ্চনা

আদিবাসী নারীদের আইনি লড়াইয়ের প্রধান বাধা হলো **হিন্দু উত্তরাধিকার আইন (HSA), ১৯৫৬**-এর গঠনগত সীমাবদ্ধতা:

- **ধারা ২(১)-এর পরিধি:** এই ধারা অনুযায়ী হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন ও শিখ ধর্মাবলম্বীরা এই আইনের আওতাভুক্ত। অতীতে আদালত অনেক সময় আদিবাসীদের 'হিন্দু রীতিনীতি' পালনের ভিত্তিতে এই আইনের অধীনে নিয়ে আসত, যাকে **'হিন্দুকরণ'** বলা হয়।
- **ধারা ২(২)-এর বাধা:** এটি একটি বিশেষ ধারা যা স্পষ্ট করে দেয় যে, ধারা ২(১)-এ যা-ই থাকুক না কেন, **তফসিলি উপজাতিদের (ST)** ওপর এই আইন কার্যকর হবে না (যদি না কেন্দ্র সরকার বিশেষ বিজ্ঞপ্তি জারি করে)।
- **২০০৫ সালের সংশোধনীর প্রভাব:** ২০০৫ সালে পৈতৃক সম্পত্তিতে কন্যাদের সমানাধিকার দেওয়া হলেও ধারা ২(২)-এর কারণে আদিবাসী নারীরা এই সুবিধা থেকে বঞ্চিত থেকে যান।
- **বৈষম্যমূলক পরিস্থিতি:** এর ফলে একই অঞ্চলের একজন অ-আদিবাসী নারী আইনি সুরক্ষা পেলেও, একজন আদিবাসী নারী কেবল প্রথাগত আইনের ওপর নির্ভরশীল থাকেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই **প্রথাগত আইন** পুরুষতান্ত্রিক, যা জমি কেবল পুরুষ বংশধরদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে চায়।

'হিন্দু'র সংজ্ঞা ও 'হিন্দুকরণ'-এর সমালোচনা

'হিন্দু' শব্দের কোনো নির্দিষ্ট বা কঠোর সংজ্ঞা না থাকায় আদিবাসীদের আইনি অবস্থান জটিল হয়ে পড়েছে:

- **আদালতের ব্যাখ্যা:** ১৯৬৬ সালের একটি ঐতিহাসিক মামলায় সুপ্রিম কোর্ট হিন্দু ধর্মকে একটি নির্দিষ্ট ধর্মের বদলে **'জীবনযাপনের পদ্ধতি'** (Way of life) হিসেবে বর্ণনা করেছে।
- **পরিচয়ের সংকট:** কোনো আদিবাসী ব্যক্তি যদি দীর্ঘকাল ধরে তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি ত্যাগ করে হিন্দু রীতিনীতি পালন করেন, তবেই তাকে হিন্দু হিসেবে গণ্য করা হয়।
- **আদিবাসীদের ওপর প্রভাব:** এর ফলে আদিবাসী নারীদের সামনে একটি কঠিন শর্ত দাঁড়িয়ে যায়—হয় অর্থনৈতিক অধিকারের জন্য নিজের **জাতিগত পরিচয় ত্যাগ করে** 'হিন্দু' হতে হবে, অথবা নিজের পরিচয় বজায় রেখে **ভূমিহীন** থাকতে হবে।

বিচারবিভাগীয় হস্তক্ষেপ: দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন

সাম্প্রতিক রায়গুলোতে 'রূপান্তরমূলক সাংবিধানিকতা' (Transformative Constitutionalism)-এর মাধ্যমে আদিবাসী প্রথাগত আইনের সীমাবদ্ধতা দূর করার চেষ্টা করা হয়েছে।

- **সাম্যের নীতি (রাম চরণ বনাম সুখরাম, ২০২৫):** আদালত স্বীকার করেছে যে, পৈতৃক সম্পত্তি থেকে কন্যাদের বঞ্চিত করা **ধারা ১৪** (সাম্যের অধিকার) এবং **ধারা ১৫(১)** (বৈষম্যহীনতা)-এর পরিপন্থী। কোনো নির্দিষ্ট আইন না থাকলে 'ন্যায়বিচার, সাম্য এবং শুদ্ধ বিবেক'-এর ভিত্তিতে নারীদের অধিকার নিশ্চিত করতে হবে।
- **আদালতের এক্তিয়ার পুনর্নির্ধারণ (নওয়াং বনাম বাহাদুর, ২০২৫):** সুপ্রিম কোর্ট হিমাচল প্রদেশ হাইকোর্টের একটি রায় বাতিল করে স্পষ্ট জানায় যে, আদিবাসীদের ওপর জোর করে হিন্দু উত্তরাধিকার আইন (HSA) চাপিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা আদালতের নেই; এই দায়িত্ব কেবল **সংসদের** (Parliament)।
- **নিজস্ব সত্তার সুরক্ষা:** আদালত নিশ্চিত করেছে যে, কেন্দ্র সরকার নতুন কোনো নিয়ম জারি না করা পর্যন্ত আদিবাসীদের উত্তরাধিকার তাদের নিজস্ব **প্রথাগত রীতিনীতি** অনুসারেই চলবে। এর ফলে 'হিন্দুকরণ'-এর মাধ্যমে অধিকার পাওয়ার অনিশ্চিত প্রথাটির অবসান ঘটেছে।

এর কৌশলগত গুরুত্ব: কেন এটি জরুরি?

আদিবাসী উত্তরাধিকার আইনের এই পুনর্মূল্যায়ন কেবল আইনি বিষয় নয়, এর সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী:

- **অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন:** সম্পত্তির অধিকার থাকলে আদিবাসী নারীরা ঋণের জন্য বন্ধক রাখার সুযোগ পাবেন, যা তাঁদের **উদ্যোক্তা হওয়া এবং আর্থিক স্বনির্ভরতায়** সাহায্য করবে। এটি দারিদ্র্য বিমোচনে একটি সুরক্ষা কবচ হিসেবে কাজ করবে।
- **সামাজিক ন্যায়বিচার:** এই আইনি সংস্কার আদিবাসী নারীদের "দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক" হিসেবে গণ্য হওয়ার গ্লানি থেকে মুক্তি দেবে এবং সংবিধান প্রদত্ত **প্রকৃত সাম্য** (Substantive Equality) নিশ্চিত করবে।
- **স্বকীয়তা বজায় রেখে উন্নয়ন:** আদিবাসীদের ওপর জোর করে হিন্দু আইন না চাপিয়ে বরং তাদের জন্য **পৃথক আইন** তৈরির দাবি জানানো হয়েছে। এর ফলে তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি ও পরিচয় অক্ষুণ্ণ রেখেই আধুনিকীকরণ সম্ভব হবে।

বহুমাত্রিক চ্যালেঞ্জ: সংস্কারের পথে বাধা

বিচারবিভাগীয় তৎপরতা সত্ত্বেও আদিবাসী নারীদের উত্তরাধিকার নিশ্চিত করার পথে বেশ কিছু প্রতিবন্ধকতা রয়েছে:

- **ভূমি বিচ্ছিন্ন হওয়ার ভয়** (Land Alienation): পঞ্চম ও ষষ্ঠ তফসিলভুক্ত এলাকায় অনেক সম্প্রদায় আশঙ্কা করে যে, ভিন্ন জাতে বিয়ের মাধ্যমে জমি অ-আদিবাসীদের হাতে চলে যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, **ছোটনাগপুর প্রথা** (CNTSP Act, 1908) অনুযায়ী জমি কেবল পুরুষ বংশধরদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা হয়।

- **অলিখিত আইন ও অনিশ্চয়তা:** অলিখিত **প্রথাগত আইন** অনেক সময় পুরুষতান্ত্রিক প্রভাবশালীদের দ্বারা অপব্যাখ্যার শিকার হয়। যেমন, নাগাল্যান্ডের **ধারা ৩৭১এ** অনুযায়ী প্রতিটি গ্রামের ভিন্ন ভিন্ন প্রথা থাকতে পারে, যা প্রমাণ করা নারীদের জন্য অত্যন্ত কঠিন।
- **পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা:** জমিকে কেবল 'পুরুষের সম্পত্তি' হিসেবে দেখার প্রবণতা এতটাই প্রবল যে, অনেক সময় আদালত থেকে অধিকার পেলেও সামাজিক চাপে নারীরা তা ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। এটি সংবিধানের **ধারা ২১** (মর্যাদার সাথে বাঁচার অধিকার)-এর পরিপন্থী।
- **আইনি শূন্যতা (Legal Limbo):** ২০২৫ সালের রায়গুলোতে আদালত সাম্যের কথা বললেও সরাসরি হিন্দু উত্তরাধিকার আইন (HSA) আদিবাসীদের ওপর প্রয়োগ করতে নিষেধ করেছে। ফলে সংসদ নতুন আইন না করা পর্যন্ত আদিবাসী নারীরা এক ধরণের আইনি শূন্যতার মধ্যে রয়েছেন।
- **বাস্তবায়নের বৈষম্য:** শিক্ষা ও সচেতনতার অভাবে গোণ্ড (Gond) বা ওরাওঁ (Oraon) সম্প্রদায়ের মতো এলাকাগুলোতে **PESA বা গ্রামসভার** মাধ্যমেও নারীদের অধিকার সঠিকভবে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে না।

উত্তরণের পথ: বৈষম্য দূর করার উপায়

সাংবিধানিক নৈতিকতা এবং আদিবাসী স্বায়ত্তশাসনের মধ্যে সমন্বয় আনতে একটি বহুমুখী কৌশল প্রয়োজন:

- **মিজোরাম মডেল অনুসরণ:** ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা বা ছত্তিশগড়ের মতো রাজ্যগুলো মিজোরামের মতো নিজস্ব উত্তরাধিকার আইন তৈরি করতে পারে। যেখানে কন্যাদের অংশ দেওয়া হয়, আবার জমি যাতে অ-আদিবাসীদের হাতে না যায় তার সুরক্ষাকবচও থাকে।
- **সংসদীয় হস্তক্ষেপ:** যেহেতু আদালত সরাসরি আইন প্রয়োগ করতে পারে না, তাই সংসদের উচিত **'আদিবাসী উত্তরাধিকার আইন' (Tribal Succession Act)** প্রণয়ন করা। এটি ২০০৫ সালের হিন্দু আইনের সাম্য বজায় রাখবে কিন্তু আদিবাসীদের ভূমি মালিকানার ধরণকে (যেমন- FRA, 2006) শ্রদ্ধা জানাবে।
- **প্রাতিষ্ঠানিক শক্তি বৃদ্ধি: জাতীয় তফসিলি উপজাতি কমিশন (NCST)** এবং আদিবাসী উপদেষ্টা পরিষদগুলোকে আরও শক্তিশালী করতে হবে। গ্রামীণ এলাকায় দ্রুত ন্যায়বিচারের জন্য 'ফাস্ট-ট্র্যাক ট্রাইবাল কোর্ট' তৈরি করা প্রয়োজন।
- **নীতিগত সমন্বয়:** বন অধিকার আইন (FRA) এবং PESA-র অধীনে জমি বণ্টনের সময় বাধ্যতামূলকভাবে 'জেন্ডার অডিট' বা লিঙ্গভিত্তিক নিরীক্ষা করতে হবে যাতে নারীদের নাম নথিপত্রে থাকে।

উপসংহার

আদিবাসী নারীদের উত্তরাধিকার অধিকারের পুনর্মূল্যায়ন হলো **প্রকৃত সাম্য (Substantive Equality)** অর্জনের একটি ধাপ। আদিবাসীদের জোর করে 'হিন্দু' হিসেবে চিহ্নিত না করে বরং সংবিধানের **ধারা ১৪ ও ১৫**-কে তাদের প্রথাগত জীবনের সাথে যুক্ত করাই মূল লক্ষ্য। প্রকৃত ক্ষমতায়ন তখনই আসবে, যখন একজন আদিবাসী নারীকে তার পৈতৃক অধিকার পাওয়ার জন্য নিজের **জাতিগত পরিচয় বিসর্জন দিতে হবে না**।

প্রশ্ন: *রূপান্তরমূলক সাংবিধানিকতা (Transformative Constitutionalism) মৌলিক অধিকারের সাথে প্রথাগত রীতিনীতির সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করে। আদিবাসী নারীদের উত্তরাধিকার অধিকারের প্রেক্ষিতে এই উক্তিটি বিশ্লেষণ করুন। (২৫০ শব্দ)*

1.3. আন্তর্জাতিক সম্পর্ক

1.3.1. ভারত-ইসরায়েল কৌশলগত অংশীদারিত্ব

প্রেক্ষাপট

পশ্চিম এশিয়ার বর্তমান অস্থিতিশীল ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে—যেখানে পারস্য উপসাগরে মার্কিন সামরিক উপস্থিতি এবং গাজায় একটি ভঙ্গুর যুদ্ধবিরতি বিদ্যমান—ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইসরায়েলে একটি উচ্চ-পর্যায়ের **'স্ট্যান্ডঅ্যালোন'** (Standalone) বা একক সফর করছেন। এই সফর ভারতের **"ডি-হাইফেনেশন"** (De-hyphenation) নীতিকে আরও সুদৃঢ় করছে। ২০১৭ সালের ঐতিহাসিক সফরের পর এটি কোনো ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর দ্বিতীয় ইসরায়েল সফর।

ইসরায়েলের প্রতি ভারতের 'ডি-হাইফেনেশন' নীতি

১. ঐতিহাসিক পটভূমি

- **ইসরায়েল রাষ্ট্র গঠন:** ১৯৪৭ সালে 'বেলফোর ঘোষণা'র পর ইসরায়েল রাষ্ট্র গঠিত হয়। রাষ্ট্রসংঘের বিভাজন পরিকল্পনা অনুযায়ী দুটি পৃথক রাষ্ট্র—ইহুদিদের জন্য ইসরায়েল এবং আরবদের জন্য ফিলিস্তিন গঠনের কথা থাকলেও, এর ফলে ফিলিস্তিনিরা বাস্তুচ্যুত হয় এবং একটি দীর্ঘস্থায়ী সংঘাতের সূত্রপাত ঘটে।
- **ভারতের প্রাথমিক 'হাইফেনেটেড' নীতি:** আঞ্চলিক সংঘাতের কারণে ভারত শুরুতে **'হাইফেনেটেড ওয়েস্ট এশিয়া পলিসি'** অনুসরণ করত। এর অর্থ হলো, ইসরায়েল ও ফিলিস্তিনকে পররাষ্ট্রনীতির একটি একক ব্লক হিসেবে বিবেচনা করা হতো। ১৯৫০ সালে ইসরায়েলকে স্বীকৃতি দিলেও ভারত নিম্নোক্ত অবস্থান বজায় রেখেছিল:
  - কয়েক দশক ধরে পূর্ণ কূটনৈতিক সম্পর্ক এড়িয়ে চলা।
  - ফিলিস্তিনি দাবির প্রতি জোরালো সমর্থন এবং ১৯৮৮ সালে ফিলিস্তিনকে রাষ্ট্রের স্বীকৃতি প্রদান।
  - এই নীতির মূল সমস্যা ছিল—ইসরায়েলের সাথে ঘনিষ্ঠতা মানেই ফিলিস্তিনকে পরিত্যাগ করা হিসেবে গণ্য হতো।

২. ডি-হাইফেনেশনের আগে গুরুত্বপূর্ণ কূটনৈতিক মাইলফলক

- **২০০০ সাল:** কার্গিল যুদ্ধের সময় ইসরায়েলের সমর্থনের পর বাজপেয়ী সরকার প্রথমবারের মতো উচ্চ-পর্যায়ের মন্ত্রীদলকে ইসরায়েলে পাঠায় (যশবন্ত সিং এবং এল.কে. আদভানি)।
- **২০০৩ সাল:** এরিয়েল শ্যারন প্রথম ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ভারত সফর করেন।
- **২০১৫ সাল:** রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জি এই অঞ্চলে সফর করেন, তবে তিনি ইসরায়েল ও ফিলিস্তিন—উভয় দেশই সফর করেন, যা পূর্বের 'হাইফেনেটেড' পদ্ধতির ধারাবাহিকতা ছিল।

৩. 'ডি-হাইফেনেশন' (De-Hyphenation) নীতি কী?

এর অর্থ হলো—ইসরায়েল এবং ফিলিস্তিনের সাথে সম্পর্ককে দুটি **সম্পূর্ণ পৃথক পথে** চালিত করা। এই পদ্ধতিতে:

- ইসরায়েল থেকে **প্রতিরক্ষা প্রযুক্তি** সংগ্রহ করা যাবে।
- একইসাথে একটি স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের প্রতি সমর্থন অব্যাহত রাখা যাবে।
- গাজায় মানবিক সহায়তা পাঠানো সম্ভব হবে।
- **সহজ কথায়:** একটির সাথে সম্পর্ক অন্যটির ওপর নির্ভরশীল হবে না। ২০১৭ সালে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রথম একক ইসরায়েল সফর এই কূটনৈতিক প্রথার ভাঙন ঘটায়।

৪. ভারত-ইসরায়েল সম্পর্কের বিবর্তন

এই দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে তিনটি প্রধান পর্যায়ে ভাগ করা যায়:

১. **'নিষিদ্ধ' পর্যায় (১৯৫০ – ১৯৮০-এর দশক):** শীতল যুদ্ধ এবং আরব দেশগুলোর সাথে সংহতির কারণে ইসরায়েলের সাথে বন্ধুত্বকে একপ্রকার 'সামাজিক বাধা' বা Taboo মনে করা হতো।

২. **'সতর্ক অবস্থান' (১৯৯২):** 'অসলো চুক্তি'র মাধ্যমে আরব-ইসরায়েল শান্তি প্রক্রিয়া শুরু হলে ভারত ইসরায়েলের সাথে পূর্ণ কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করে।

৩. **'কৌশলগত মাত্রা' (২০১৪ – বর্তমান):** সম্পর্কটি এখন প্রকাশ্যে **কৌশলগত** রূপ নিয়েছে। ২০২৬ সালের এই সফর ভারতের এই দৃঢ় অবস্থানেরই প্রতিফলন।

৫. সহযোগিতার আধুনিক মাত্রা

- **অস্ত্র থেকে জল (Weapons to Water):** ভারত বর্তমানে ইসরায়েলি প্রতিরক্ষা সরঞ্জামের বৃহত্তম ক্রেতা (ইসরায়েলের মোট রপ্তানির ৩৪%)। প্রতিরক্ষার পাশাপাশি উন্নত কৃষি এবং জল ব্যবস্থাপনার জন্য ভারতে **৩৫টি 'সেন্টার অফ এক্সিলেন্স'** স্থাপিত হয়েছে।
- **জাতিসংঘে ভোটদানের পরিবর্তন:** অতীতে ভারত সব সময় ইসরায়েলের বিপক্ষে ভোট দিত। বর্তমানে ভারত নির্দিষ্ট কিছু ভোটে (যেমন হামাসের নিন্দা না জানানো যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব) **অনুপস্থিত (Abstain)** থাকছে। ভারতের অবস্থান স্পষ্ট: ফিলিস্তিনকে সমর্থন করা হবে, কিন্তু সন্ত্রাসবাদ কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।

ভারতের কাছে ইসরায়েল কেন গুরুত্বপূর্ণ?

১. **সংকটকালীন প্রতিরক্ষা সহায়তা:** কার্গিল যুদ্ধের সময় যখন ভারত আন্তর্জাতিক নানা বিধি-নিষেধের সম্মুখীন হয়েছিল, তখন ইসরায়েল একটি নির্ভরযোগ্য **কৌশলগত অংশীদার** হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

- **লেজার-গাইডেড বোমা (LGBs):** দুর্গম পাহাড়ে নিখুঁত লক্ষ্যভেদে সহায়তার জন্য এগুলো সরবরাহ করেছিল।
- **ড্রোন (UAVs):** রিয়েল-টাইম নজরদারির জন্য 'সার্চার' ও 'হেরন' ড্রোন প্রদান করেছিল।
- অন্যান্য পশ্চিমা দেশগুলোর তুলনায় ইসরায়েল সংকটের মুহূর্তে ভারতকে যেভাবে সহায়তা করেছে, তা দেশটিকে একটি বিশ্বস্ত অংশীদার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

২. **উন্নত প্রতিরক্ষা প্রযুক্তি ও যৌথ উন্নয়ন:** ভারত ইসরায়েলের অত্যাধুনিক সামরিক প্রযুক্তির অন্যতম প্রধান গন্তব্য। উল্লেখযোগ্য উদাহরণগুলো হলো:

- **বারাক-৮ / MRSAM:** ডিআরডিও (DRDO)-র সাথে যৌথভাবে তৈরি ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থা।
- **ফ্যালকন (Phalcon) AWACS:** ভারতীয় বিমানে বসানো উন্নত নজরদারি ব্যবস্থা।
- **স্পাইক (Spike):** ট্যাঙ্ক-বিধ্বংসী গাইডেড মিসাইল।
- এই প্রযুক্তিগুলো ভারতের আকাশ প্রতিরক্ষা, যুদ্ধক্ষেত্রের সচেতনতা এবং আঘাত হানার ক্ষমতাকে বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে।

৩. **সন্ত্রাসবাদ দমন ও অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা:** সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলায় ইসরায়েলের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা ভারতের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তায় বিশেষভাবে সহায়ক:

- **গোয়েন্দা তথ্য আদান-প্রদান** এবং নগর যুদ্ধ (Urban warfare) কৌশল।
- **সীমান্ত ব্যবস্থাপনা** এবং অভ্যন্তরীণ সুরক্ষা।
- নজরদারি ব্যবস্থা, ইলেকট্রনিক ওয়ারফেয়ার এবং সাইবার নিরাপত্তা সরঞ্জাম ভারতের সীমান্ত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় অত্যন্ত কার্যকর।

৪. **কৃষি ও জল ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি:** প্রযুক্তি হস্তান্তরের মাধ্যমে ইসরায়েল ভারতের খাদ্য ও জল নিরাপত্তা নিশ্চিতে বড় ভূমিকা রাখছে:

- **ড্রিপ ইরিগেশন** এবং ক্ষুদ্র সেচ ব্যবস্থা।
- মরু-অঞ্চলে কৃষিকাজ এবং জল পুনর্ব্যবহার ও লবণাক্ততা দূরীকরণ (Desalination) প্রযুক্তি।
- ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে ৩০টিরও বেশি **ইন্দো-ইসরায়েল 'সেন্টার অফ এক্সিলেন্স'** বর্তমানে উদ্যানপালন ও শুষ্ক জমিতে চাষাবাদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে কাজ করছে।

৫. অর্থনৈতিক ও উন্নয়নমূলক ভিত্তি: প্রতিরক্ষার বাইরেও এই সম্পর্ক ভারতের অভ্যন্তরীণ উন্নয়নের অন্যান্য ক্ষেত্রেও বিস্তৃত:

- **জল ও কৃষি:** ইসরায়েলের 'মাশাভ' (MASHAV) সংস্থার সহায়তায় রাজস্থান ও হরিয়ানার মতো জলসংকটে থাকা রাজ্যে ড্রিপ ইরিগেশন ও জল ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।
- **বাণিজ্য ও বিনিয়োগ:** ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ৩.৭৫ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে। ২০২৫ সালের সেপ্টেম্বরে স্বাক্ষরিত **দ্বিপাক্ষিক বিনিয়োগ চুক্তি** এবং চলমান **মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির (FTA)** লক্ষ্য হলো ইলেকট্রনিক্স, চিকিৎসা সরঞ্জাম এবং সবুজ জ্বালানিতে বাণিজ্যের প্রসার ঘটানো।
- **আইমেক (IMEC) করিডোর:** ভারত-মধ্যপ্রাচ্য-ইউরোপ অর্থনৈতিক করিডোরকে পুনরুজ্জীবিত করা ভারতের একটি লক্ষ্য। সুয়েজ খালের বিকল্প হিসেবে ইসরায়েলের **হাইফা বন্দরকে** কেন্দ্র করে ইউরোপে ভারতীয় পণ্য পাঠানোর ক্ষেত্রে এই করিডোর একটি সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করবে।

আঞ্চলিক প্রেক্ষাপট এবং "হেক্সাগোনাল অ্যালায়েন্স" (Hexagonal Alliance) প্রস্তাব

ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু এই অঞ্চলের "উগ্র অক্ষ" (Radical axes) মোকাবিলায় ভারত, গ্রিস, সাইপ্রাস এবং আরব দেশগুলোকে নিয়ে একটি ছয়-পক্ষীয় জোট বা **"হেক্সাগোনাল অ্যালায়েন্স"**-এর প্রস্তাব দিয়েছেন। এটি ভারতের জন্য একটি জটিল কূটনৈতিক পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে।

পশ্চিম এশিয়ার ভূ-রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ

পশ্চিম এশিয়ার প্রতিদ্বন্দ্বিতার জটিল জাল মোকাবিলা করা ভারতের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ:

- **ইরান সংকট:** ইরান ইসরায়েলের ঘোর বিরোধী এবং ফিলিস্তিনিদের কট্টর সমর্থক। ভারতের জন্য মধ্য এশিয়ায় পৌঁছাতে **চাবাহার বন্দর** অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইসরায়েলের প্রস্তাবিত এই জোটে যোগ দিলে তেহরানের সাথে ভারতের সম্পর্ক মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।
- **তুরস্ক ফ্যাক্টর:** মুসলিম বিশ্বে নেতৃত্ব বজায় রাখতে তুরস্ক ইসরায়েলের বিরোধিতা করে। আবার কাশ্মীর ইস্যুতে তুরস্ক পাকিস্তানকে সমর্থন করায় ভারতকে এই পথ অত্যন্ত সতর্কতার সাথে চলতে হয়।
- **উদারপন্থী আরব দেশ:** বর্তমানে সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং ওমানের সাথে ভারতের বিশাল বাণিজ্যিক সম্পর্ক রয়েছে। I2U2 কাঠামোর পর এই দেশগুলো ভারতের সাথে ইসরায়েলের ঘনিষ্ঠতাকে এখন স্বাভাবিকভাবেই গ্রহণ করছে।
- **মার্কিন ফ্যাক্টর:** অতীতে ভারত মধ্যপ্রাচ্যে আমেরিকার উপস্থিতির বিরোধিতা করলেও, বর্তমানে ভারত ও আমেরিকা এই অঞ্চলে স্থিতিশীলতা আনতে এবং I2U2 ও IMEC বাণিজ্য পথের মতো অংশীদারিত্বে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করছে।

ভবিষ্যতের পথ: "নীতিগত বাস্তববাদ" (Principled Pragmatism)

পশ্চিম এশিয়ায় ভারতের ভবিষ্যৎ গতিপথ জাতীয় স্বার্থ এবং নৈতিক কূটনীতির ভারসাম্যের ওপর ভিত্তি করে হওয়া উচিত:

- **কৌশলগত স্বায়ত্তশাসন (Strategic Autonomy) বজায় রাখা:** নেতানিয়াহুর প্রস্তাবিত "হেক্সাগোনাল অ্যালায়েন্স" বিনয়ের সাথে প্রত্যাখ্যান করা উচিত। তৃতীয় কোনো দেশের বিরুদ্ধে সামরিক জোটে যোগ না দেওয়ার দীর্ঘস্থায়ী নীতি ভারতকে আঞ্চলিক সাম্প্রদায়িক সংঘাত থেকে দূরে রাখে।
- **উন্নয়নমূলক প্রবৃদ্ধিকে অগ্রাধিকার:** ইসরায়েলের সাথে সম্পর্ককে মূলত অত্যাধুনিক প্রতিরক্ষা প্রযুক্তি (**মিশন সুদর্শন চক্র**), উন্নত কৃষি এবং জল ব্যবস্থাপনার মতো ভারতের অভ্যন্তরীণ লক্ষ্যগুলো পূরণে ব্যবহার করা উচিত।

- **আঞ্চলিক স্থিতিশীলতার পক্ষে সওয়াল:** ইসরায়েল এবং আরব বিশ্ব—উভয়ের বন্ধু হিসেবে ভারত তার অনন্য অবস্থান ব্যবহার করে একটি শান্তিপূর্ণ **'দ্বি-রাষ্ট্রীয় সমাধান'** (Two-state solution)-এর পক্ষে কথা বলতে পারে। IMEC করিডোরের মতো অর্থনৈতিক প্রকল্পগুলোর দীর্ঘমেয়াদী সাফল্যের জন্য এই স্থিতিশীলতা জরুরি।
- **গ্লোবাল সাউথ-এর নেতৃত্ব:** তেল আবিবের সাথে সম্পর্ক গভীর করার পাশাপাশি গাজায় মানবিক স্থিতিশীলতার পক্ষে ভারতের সোচ্চার থাকা উচিত, যাতে উন্নয়নশীল দেশগুলোর কাছে ভারতের নৈতিক অবস্থান অটুট থাকে।

উপসংহার

এই সফর ভারত ও ইসরায়েলের মধ্যে একটি পরিপক্ক ও স্বার্থ-চালিত অংশীদারিত্বের প্রতিফলন। প্রতিরক্ষা সহযোগিতা সম্পর্কের মূলে থাকলেও এখন তা প্রযুক্তি, কৃষি, উদ্ভাবন এবং সংযোগ (Connectivity) পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। তবে পশ্চিম এশিয়ার জটিল ভূ-রাজনীতিতে এই সম্পৃক্ততা অত্যন্ত সতর্কতার সাথে বজায় রাখতে হবে।

"নীতিগত বাস্তববাদ"—অর্থাৎ কৌশলগত স্বায়ত্তশাসন, অর্থনৈতিক সহযোগিতা এবং শান্তির প্রতি অঙ্গীকারের সমন্বয়—ভারতের জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করার পাশাপাশি আঞ্চলিক স্থিতিশীলতায় গঠনমূলক অবদান রাখতে সাহায্য করবে।

প্রশ্ন: *ভারতের পররাষ্ট্রনীতিতে ইসরায়েলের কৌশলগত গুরুত্ব আলোচনা করুন। ভারত-ইসরায়েল সম্পর্ক কীভাবে 'সতর্ক সংযোগ' থেকে একটি 'উন্মুক্ত কৌশলগত অংশীদারিত্বে' রূপান্তরিত হয়েছে? (২৫০ শব্দ)*

***

Scan to know more about our courses...

IAS 2-Year GS PCM | IAS 10-Month GS PCM | Degree + IAS | Prelims Test Series

সাধারণ স্টাডিজ ৩

2.1. অর্থনীতি

2.1.1. ভারতের ক্রিটিক্যাল মিনারেলস স্ট্র্যাটেজি: নীতিগত পরিবর্তন থেকে কৌশলগত মূলধারা পর্যন্ত

প্রেক্ষাপট

- **২০২৬-২৭ সালের কেন্দ্রীয় বাজেট** একটি নিষ্পত্তিমূলক আমূল পরিবর্তনের (Paradigm Shift) সাক্ষ্য দেয়: গুরুত্বপূর্ণ খনিজ বা ক্রিটিক্যাল মিনারেলস এখন ভারতের শিল্প ব্যবস্থা, শক্তি রূপান্তর, প্রতিরক্ষা এবং ভূ-রাজনৈতিক কৌশলের একটি **মূল স্তম্ভ** (Core Pillar) হিসেবে স্থান পেয়েছে।
- মাত্র তিন বছর আগে, ২০২৩ সালে ভারতের **G20 প্রেসিডেন্সি** চলাকালীনও নীতিগত আলোচনায় এই খনিজগুলো ছিল প্রান্তিক পর্যায়ে। তখন লিথিয়ামের মতো খনিজগুলো 'পারমাণবিক খনিজ' (Atomic Minerals) হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ ছিল, যা বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণের পথ রুদ্ধ করে রেখেছিল।
- এই বছরের বাজেট বক্তৃতার গুরুত্ব ইঙ্গিত দেয় যে ভারত এখন "নীতি থাকা উচিত কি না" সেই পর্যায় থেকে উত্তরণ ঘটিয়ে **"কীভাবে এটি বড় আকারে, দ্রুত এবং নিবিড়ভাবে কার্যকর করা যায়"** সেই পর্যায়ে পৌঁছেছে। এই পদক্ষেপ **আত্মনির্ভর ভারত, বিকশিত ভারত @২০৪৭** এবং **নেট জিরো ২০৭০** লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের সাথে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ।

গুরুত্বপূর্ণ খনিজ (Critical Minerals) সম্পর্কে ধারণা

গুরুত্বপূর্ণ খনিজ বলতে এমন কিছু জ্বালানি-বহির্ভূত এবং লৌহ-বিহীন ধাতু ও তাদের যৌগকে বোঝায়, যা **পরিচ্ছন্ন শক্তি রূপান্তর** (Clean Energy Transition), উন্নত উৎপাদন ব্যবস্থা, প্রতিরক্ষা প্রযুক্তি এবং **ডিজিটাল অর্থনীতির** জন্য অপরিহার্য। এই খনিজগুলো বৈদ্যুতিক গাড়ি (EV), ব্যাটারি, সৌর প্যানেল, উইন্ড টারবাইন, সেমিকন্ডাক্টর এবং **রেয়ার আর্থ ম্যাগনেট**-এর মতো অত্যাধুনিক প্রযুক্তির মূল ভিত্তি।

- **ভারতের সরকারি তালিকা (৩০টি খনিজ): 'খনি ও খনিজ (উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ) [MMDR] সংশোধনী আইন, ২০২৩'**-এর অধীনে এই তালিকাটি সূচিত হয়েছে। এই আইনটি খনির নিলাম এবং বেসরকারি অংশগ্রহণকে আরও সহজতর করেছে। এই তালিকায় **লিথিয়াম**, কোবাল্ট, নিকেল, গ্রাফাইট, **রেয়ার আর্থ এলিমেন্টস (REEs) (নিওডিয়ামিয়াম এবং ডিসপ্রোসিয়াম-এর মতো ১৭টি উপাদানের একটি গ্রুপ)**, বেরিলিয়াম, ট্যানটালাম, নিওবিয়াম, টাংস্টেন, ফসফরাস এবং অন্যান্য খনিজ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
- **বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট: মার্কিন ভূতাত্ত্বিক জরিপ** (USGS) ২০২৫-এর তথ্য অনুযায়ী, ২০টিরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ খনিজের উত্তোলন এবং প্রক্রিয়াকরণ ক্ষমতার **৬০-৯০% চীনের নিয়ন্ত্রণে**। এটি বৈশ্বিক সরবরাহ ব্যবস্থার দুর্বলতাকে প্রকাশ করে, যা ২০২৫ সালের রেয়ার আর্থ ম্যাগনেট নিষেধাজ্ঞা এবং বিশ্বব্যাপী ব্যাটারি সংকটের সময় পরিলক্ষিত হয়েছে।
- **প্রধান ঝুঁকি:** ২০৭০ সালের মধ্যে ভারতের **নিট-জিরো (Net-Zero)** অঙ্গীকার এবং বিশ্বব্যাপী কার্বন নিঃসরণ কমানোর লক্ষ্যমাত্রার মাঝে—খনিজের অত্যধিক **মূল্য অস্থিরতা**, প্রভাবশালী দেশগুলোর সরবরাহ ব্যবস্থাকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার এবং ক্রমবর্ধমান **ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনা** বড় ঝুঁকি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ভারতের জন্য গুরুত্বপূর্ণ খনিজ কেন তাৎপর্যপূর্ণ?

গুরুত্বপূর্ণ খনিজ আহরণ ভারতের জন্য একটি **কৌশলগত অনিবার্যতা**। এটি **খনিজ নিরাপত্তা** নিশ্চিত করার মাধ্যমে **আত্মনির্ভর ভারত** গড়ার লক্ষ্যকে ত্বরান্বিত করবে।

১. **অর্থনৈতিক নিরাপত্তা:**

- লিথিয়াম (অস্ট্রেলিয়া/চিলি), নিকেল এবং কোবাল্ট (কঙ্গো/ইন্দোনেশিয়া)-এর মতো গুরুত্বপূর্ণ ব্যাটারি ধাতুর ক্ষেত্রে **১০০% আমদানি নির্ভরতা** হ্রাস পাবে।
- এটি **উৎপাদন ভিত্তিক প্রণোদনা (PLI)** প্রকল্পগুলোতে গতি আনবে; যার মধ্যে উন্নত রসায়ন সেলের (Advanced Chemistry Cells) জন্য **১৮,১০০ কোটি টাকা** এবং সোলার পিভি মডিউলের জন্য **২৪,০০০ কোটি টাকা** বরাদ্দ রয়েছে।

২. **শক্তি রূপান্তর (Energy Transition):**

- প্যারিস চুক্তির অধীনে ভারতের **জাতীয়ভাবে নির্ধারিত অবদান (NDC)** অনুযায়ী, ২০৩০ সালের মধ্যে **৫০০ গিগাওয়াট জীবাশ্ম-বিহীন জ্বালানি** সক্ষমতা অর্জনে সহায়তা করবে।
- এটি **প্রধানমন্ত্রী সূর্য ঘর** (১ কোটি পরিবারের জন্য ছাদে সোলার) এবং **FAME-III** (২০৩০ সালের মধ্যে যানবাহন বিক্রিতে ৩০% ইভি লক্ষ্যমাত্রা)-এর মতো ফ্ল্যাগশিপ উদ্যোগগুলোকে শক্তি যোগাবে।

৩. **ভূ-রাজনৈতিক শ্রেষ্ঠত্ব:**

- প্রক্রিয়াকরণ ক্ষেত্রে চীনের **৬০-৯০% একচেটিয়া আধিপত্য** মোকাবিলায় এটি সহায়ক হবে। পাশাপাশি এটি ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলের স্থিতিশীলতার জন্য **কোয়াড (QUAD) ক্রিটিক্যাল মিনারেলস ইনিশিয়েটিভ**-কে শক্তিশালী করবে।
- এটি **আইপিইএফ (IPEF)** সরবরাহ ব্যবস্থা এবং **ভারত-মধ্যপ্রাচ্য-ইউরোপ অর্থনৈতিক করিডোর (IMEC)**-এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে খনিজ সংগ্রহের উৎসগুলোকে বহুমুখী ও নিরাপদ করবে।

ভারতের গুরুত্বপূর্ণ খনিজ (Critical Mineral) নীতির বিবর্তন

ভারতের খনিজ নীতি নিয়ন্ত্রিত সীমাবদ্ধতা থেকে বর্তমানে একটি সক্রিয় কৌশলের দিকে দ্রুত ধাবিত হচ্ছে।

- **২০২৩-পূর্ববর্তী সময়:** নীতিগত গুরুত্ব ছিল সীমিত। লিথিয়ামের মতো খনিজগুলো **পারমাণবিক খনিজ পরিদপ্তরের (AMD)** অধীনে কঠোর নিয়ন্ত্রিত ছিল, যা বেসরকারি খাতের জন্য নিষিদ্ধ ছিল।
- **২০২৩-এর মাইলফলক: MMDR সংশোধনী আইন**-এর মাধ্যমে ৩০টি গুরুত্বপূর্ণ খনিজ চিহ্নিত করা হয় এবং প্রতিযোগিতামূলক নিলামের মাধ্যমে বেসরকারি খাতের জন্য দ্বার উন্মোচন করা হয়।
- **২০২৪-২৫:** রয়্যালটি হার যুক্তিসঙ্গত করা হয় এবং ক্ষুদ্র খনি সংস্থাগুলোর (Junior Miners) জন্য বিনিয়োগ সহজতর করা হয়।
- **জানুয়ারি ২০২৫:** প্রায় **১৬,৩০০ কোটি টাকা** ব্যয়ে **ন্যাশনাল ক্রিটিক্যাল মিনারেল মিশন (NCMM)** চালু করা হয়।
- **২০২৬-এর পরিবর্তন:** কেন্দ্রীয় বাজেট এখন কেবল নীতি নির্ধারণ নয়, বরং তা দ্রুত ও বৃহৎ পরিসরে **বাস্তবায়নের (Implementation)** ওপর জোর দিচ্ছে।

ন্যাশনাল ক্রিটিক্যাল মিনারেল মিশন (NCMM)

২০২৫ সালে চালু হওয়া এই মিশনটির লক্ষ্য ভারতকে খনিজ সম্পদে স্বনির্ভর করে তোলা।

- **আর্থিক বরাদ্দ:** উত্তোলন, প্রক্রিয়াকরণ এবং গবেষণার (R&D) জন্য ১৬,৩০০ কোটি টাকা।
- **মূল লক্ষ্য:** ২০৩১ অর্থবর্ষের মধ্যে **১,২০০টি অনুসন্ধান প্রকল্প** সম্পন্ন করা এবং উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে দুর্গম খনিজগুলোর সন্ধান চালানো।
- **প্রধান ক্ষেত্র:** খনিজ ব্লকের নিলাম, খনিজ সমৃদ্ধকরণ (Beneficiation) এবং পুনর্ব্যবহারযোগ্য (Recycling) প্রযুক্তিতে অর্থায়ন।

খনিজ উত্তোলনের মূল প্রতিষ্ঠানসমূহ

প্রতিষ্ঠান	পূর্ণরূপ ও ভূমিকা
GSI	**জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া** — জাতীয় মানচিত্রায়ন এবং প্রাথমিক খনিজ অনুসন্ধানের প্রধান সংস্থা।
NMET	**ন্যাশনাল মিনারেল এক্সপ্লোরেশন ট্রাস্ট** — আঞ্চলিক ও বিস্তারিত খনিজ অনুসন্ধানে অর্থায়ন করে।
KABIL	**খনিজ বিদেশ ইন্ডিয়া লিমিটেড** — (NALCO, HCL, MECL-এর যৌথ উদ্যোগ) বিদেশে খনিজ সম্পদ আহরণ নিশ্চিত করে।
Mission Anveshan	**ন্যাশনাল জিওসায়েন্স ডেটা রিপোজিটরি (NGDR)**-এর মাধ্যমে খনিজ অনুসন্ধানে AI ও আধুনিক ডেটা ব্যবহার করে।

প্রধান অন্তরায়: ভারত কেন ঝুঁকির মুখে?

ভারত এই খনিজগুলো সুরক্ষিত করার ক্ষেত্রে কিছু কঠিন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন:

১. **চরম আমদানি নির্ভরতা:** ৩০টি গুরুত্বপূর্ণ খনিজের মধ্যে লিথিয়াম, কোবাল্ট এবং নিকেলসহ **১০টি খনিজের ক্ষেত্রে ভারত ১০০% আমদানি নির্ভর**।

২. **চীনের প্রক্রিয়াকরণ একচেটিয়া:** খনি উত্তোলন বড় সমস্যা নয়, আসল সমস্যা প্রক্রিয়াকরণে। চীন বিশ্বব্যাপী **৫৮% লিথিয়াম, ৬৫% কোবাল্ট** এবং **৮৭% রেয়ার আর্থ** প্রক্রিয়াকরণ নিয়ন্ত্রণ করে।

৩. **দুর্বল অভ্যন্তরীণ চাহিদা:** ভারতে এখনও **ব্যাটারি বা ইভি (EV)** উৎপাদনের গতি ততোটা বৃদ্ধি পায়নি যা উৎপাদিত খনিজগুলোকে পুরোপুরি কাজে লাগাতে পারে। ফলে বিনিয়োগকারীরা বড় প্রক্রিয়াকরণ প্ল্যান্ট স্থাপনে দ্বিধাগ্রস্ত।

৪. **প্রযুক্তিগত ঘাটতি:** গভীর খনিজ অনুসন্ধান অত্যন্ত ব্যয়বহুল এবং ঝুঁকিপূর্ণ। **কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা** (AI) এবং উন্নত **ভূ-স্থানিক** (Geospatial) টুল ব্যবহারে ভারত এখনও পিছিয়ে।

খনিজ নিরাপত্তার জন্য ভারতের মাস্টার প্ল্যান: সমন্বিত কৌশল ও সমাধান

খনিজ সম্পদ সুরক্ষিত করতে ভারত এখন নিছক নীতি ঘোষণা থেকে সরে এসে ছয়টি মূল স্তম্ভের ওপর ভিত্তি করে সমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহণ করছে:

ক. স্মার্ট অনুসন্ধান (The NCMM)

- **কৌশল:** ভারত সরকার ২০২৫ সালে **ন্যাশনাল ক্রিটিক্যাল মিনারেল মিশন (NCMM)** চালু করেছে। এর অধীনে 'জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া' ২০৩০-৩১ সালের মধ্যে **১,২০০টি লক্ষ্যভিত্তিক অনুসন্ধান প্রকল্প** পরিচালনা করবে।
- **উপকারিতা:** কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) এবং উন্নত ডেটা ব্যবহারের মাধ্যমে ভারত দ্রুত স্থানীয় খনিজ ভাণ্ডার খুঁজে পাবে, যা সরাসরি আমদানি নির্ভরতা কমিয়ে আনবে।

খ. প্রক্রিয়াকরণ ও পরিশোধনে গুরুত্বারোপ

- **কৌশল:** ২০২৬-২৭ সালের কেন্দ্রীয় বাজেট অনুযায়ী, খনিজ উত্তোলনের চেয়ে উচ্চ-মানের প্রক্রিয়াকরণের ওপর বেশি জোর দেওয়া হচ্ছে। এর জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির ওপর থেকে **আমদানি শুল্ক** প্রত্যাহার করা হয়েছে। রাসায়নিক ও ওষুধ শিল্পের বিদ্যমান সক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে ব্যাটারি এবং প্রতিরক্ষা-গ্রেডের উপাদান তৈরি করা হচ্ছে।
- **উপকারিতা:** এটি সরাসরি চীনের একচেটিয়া আধিপত্যকে চ্যালেঞ্জ জানাবে এবং ভারতকে দেশীয়ভাবে নিজস্ব ব্যাটারি-গ্রেড উপাদান পরিশোধনে সক্ষম করে তুলবে।

গ. রেয়ার আর্থ ইকোসিস্টেম তৈরি (করিডোর এবং ম্যাগনেট)

- **কৌশল:** ওড়িশা, কেরালা, অন্ধ্রপ্রদেশ এবং তামিলনাড়ু—এই উপকূলীয় রাজ্যগুলোতে **'ডেডিকেটেড রেয়ার আর্থ করিডোর'** স্থাপনের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি ৬,০০০ টন **স্থায়ী চুম্বক** (Permanent Magnets) তৈরির জন্য ৭,২৮০ কোটি টাকার একটি প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে।
- **উপকারিতা:** কাঁচা বালি রপ্তানি করার পরিবর্তে এই করিডোরগুলো উত্তোলন থেকে উৎপাদন পর্যন্ত একটি সম্পূর্ণ দেশীয় সরবরাহ শৃঙ্খল তৈরি করবে।

ঘ. নিশ্চিত অভ্যন্তরীণ চাহিদা তৈরি

- **কৌশল:** ইভি (EV), ব্যাটারি স্টোরেজ এবং উইন্ড প্রজেক্টের দেশব্যাপী সম্প্রসারণকে দ্রুততর করতে হবে।
- **উপকারিতা:** এটি প্রক্রিয়াজাত খনিজের জন্য একটি নির্দিষ্ট বাজার তৈরি করবে, যা বিনিয়োগকারীদের খনিজ শোধনাগার তৈরির ক্ষেত্রে আত্মবিশ্বাস জোগাবে।

ঙ. বিশ্বব্যাপী অংশীদারিত্ব স্থাপন

- **কৌশল:** একক কোনো দেশের ওপর নির্ভরতা কমাতে ভারত সম্পদ-সমৃদ্ধ দেশগুলোর সাথে কৌশলগত সম্পর্ক স্থাপন করছে:
  - **রাশিয়া:** তেল ও অস্ত্রের বাইরে এখন **লিথিয়াম এবং রেয়ার আর্থ** নিয়ে দুই দেশ কাজ করছে। এছাড়া চেন্নাই-ভ্লাদিভোস্তক করিডোরের মাধ্যমে লজিস্টিক নেটওয়ার্ক তৈরি হচ্ছে।
  - **ব্রাজিল:** অনুসন্ধান থেকে রিসাইক্লিং—সম্পূর্ণ ভ্যালু চেইনের জন্য দুই দেশ সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে।
  - **বৈশ্বিক সম্পদ:** রাষ্ট্রীয় সংস্থা KABIL আর্জেন্টিনা এবং অস্ট্রেলিয়ায় লিথিয়াম ব্লক সুরক্ষিত করার মতো গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিচ্ছে।

চ. খনিজ অনুসন্ধানে 'এআই-ফার্স্ট' (AI-First) পদ্ধতি

আবিষ্কারের গতি বাড়াতে এবং দশকের পর দশক সময় নষ্ট রোধ করতে ভারতকে অবশ্যই খনিজ অনুসন্ধানে **বাধ্যতামূলক এআই-ফার্স্ট কৌশল** গ্রহণ করতে হবে।

- **সমন্বয়:**
  - **ইন্ডিয়া-এআই মিশন:** ডেটা-ভিত্তিক বিশ্লেষণের জন্য এআই কম্পিউট এবং মেধা ব্যবহার।
  - **জাতীয় ভূ-স্থানিক নীতি (২০২২):** ভূখণ্ড মানচিত্রায়নের জন্য উচ্চ-মানের স্যাটেলাইট এবং ড্রোন ডেটা ব্যবহার।
  - **মিশন অন্বেষণ:** হাইড্রোকার্বন অনুসন্ধানে ব্যবহৃত এআই-চালিত সিসমিক টুলগুলোকে গুরুত্বপূর্ণ খনিজ অনুসন্ধানেও ব্যবহার করা হবে।

উপসংহার

ভারত সফলভাবে গুরুত্বপূর্ণ খনিজগুলোকে তার অর্থনৈতিক ও প্রতিরক্ষা পরিকল্পনার কৌশলগত কেন্দ্রে নিয়ে আসতে পেরেছে। তবে কেবল খনি খনন করলেই ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত হবে না। প্রকৃত সাফল্য নির্ভর করবে **বৃহৎ আকারের প্রক্রিয়াকরণ প্ল্যান্ট স্থাপন**, দ্রুত **অভ্যন্তরীণ উৎপাদন চাহিদা বৃদ্ধি**, অনুসন্ধানে **এআই প্রযুক্তি গ্রহণ** এবং শক্তিশালী ও **বৈচিত্র্যময় বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব** বজায় রাখার ওপর।

প্রশ্ন: *ক্রিটিক্যাল মিনারেলস বা গুরুত্বপূর্ণ খনিজ হলো একবিংশ শতাব্দীর নতুন তেল। শক্তি রূপান্তর (Energy Transition), শিল্প নীতি এবং ভূ-রাজনৈতিক প্রতিযোগিতার প্রেক্ষাপটে ভারতের বিবর্তনীয় ক্রিটিক্যাল মিনারেলস কৌশলটি পরীক্ষা করুন।*

(২৫০ শব্দ)

2.2. পরিবেশ

2.2.1. ভারতে বোতলজাত জলের নিরাপত্তার ভ্রান্ত ধারণা এবং প্রকৃত সত্য

প্রাসঙ্গিক প্রেক্ষাপট

- বর্তমান ভারতে বোতলজাত পানীয় জল এখন আর বিলাসিতা নয়, বরং একটি অপরিহার্য নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যে পরিণত হয়েছে। মূলত পুরসভার সরবরাহ করা জলের ওপর **আস্থার অভাব** এবং "সিল করা প্লাস্টিকের জল মানেই নিরাপদ"—এই বদ্ধমূল ধারণাই এই পরিবর্তনের প্রধান কারণ।
- তবে সাম্প্রতিক বিজ্ঞানসম্মত প্রমাণ বলছে যে, বোতলজাত জল অণুজীবমুক্ত (Microbiological standards) হলেও, এর মধ্যে মিশে থাকা অদৃশ্য **রাসায়নিক ও ভৌত দূষক** মানবস্বাস্থ্য এবং পরিবেশের দীর্ঘমেয়াদী ভারসাম্যের জন্য মারাত্মক ঝুঁকি তৈরি করছে।

বোতলজাত জলের ব্যবহারের কাঠামোগত বৃদ্ধি

ভারতের বোতলজাত জলের বাজার বিশ্বের অন্যতম দ্রুত বর্ধনশীল ক্ষেত্র, যা ২০২৫-২০৩৫ সালের মধ্যে ৬.৫% হারে (CAGR) বৃদ্ধি পাবে বলে অনুমান করা হচ্ছে।

ক. বোতলজাত পানীয় জলের প্রসারের কারণসমূহ

- **ক্রমবর্ধমান নগরায়ণ**, জরাজীর্ণ জনস্বাস্থ্য পরিকাঠামো, অনিয়মিত জল সরবরাহ এবং ভূগর্ভস্থ জলের দূষণের ফলে বোতলজাত জলের ব্যবহার বহুগুণ বেড়েছে।
- রেল স্টেশন, অফিস, হাসপাতাল এবং রেস্তোরাঁগুলোতে এই জল এখন দৈনন্দিন অভ্যাসে পরিণত হয়েছে।
- অদৃশ্য দূষকগুলোর কথা বিবেচনা না করেই "সিল করা" জলকে **"নিরাপদ"** মনে করার একটি প্রবণতা জনমানসে তৈরি হয়েছে।

খ. প্রাতিষ্ঠানিক ও নিয়ন্ত্রণকারী কাঠামো

- **FSSAI** (Food Safety and Standards Authority of India) ২০০৬ সালের আইন অনুযায়ী এটি নিয়ন্ত্রণ করে।
- **BIS** (Bureau of Indian Standards) এর প্রযুক্তিগত মানদণ্ড নির্ধারণ করে।
- **নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলোর মূল নজর থাকে:**
  - ক্ষতিকারক অণুজীব বা ব্যাকটেরিয়া নিয়ন্ত্রণ।
  - নির্দিষ্ট কিছু ভারী ধাতু ও রাসায়নিক অবশিষ্টাংশের মাত্রা পরীক্ষা করা।
- তবে বর্তমান সরকারি মানদণ্ডে **মাইক্রোপ্লাস্টিক** এবং **ন্যানোপ্লাস্টিক** পরীক্ষার কোনো বাধ্যতামূলক নিয়ম নেই, যা একটি বড় ধরনের **নিয়ন্ত্রণমূলক ঘাটতি** (Regulatory gap) হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

মাইক্রোপ্লাস্টিক: এক অদৃশ্য হুমকি

৫ মিলিমিটারের কম দৈর্ঘ্যের **মাইক্রোপ্লাস্টিক** এবং ১ মাইক্রোমিটারের চেয়েও ছোট **ন্যানোপ্লাস্টিক** বর্তমানে পরিবেশ ও স্বাস্থ্যের জন্য এক নতুন চ্যালেঞ্জ।

- **ভারতীয় বাজারে ব্যাপকতা:** নাগপুর, মুম্বাই এবং অন্ধ্রপ্রদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে গবেষণায় দেখা গেছে যে, পরীক্ষা করা ১০০% নমুনায় মাইক্রোপ্লাস্টিক বিদ্যমান (প্রতি লিটারে ৭২ থেকে ২১২টি কণা)।
- **মান নিয়ন্ত্রণে বৈষম্য:** জাতীয় ব্র্যান্ডের তুলনায় স্থানীয়ভাবে বোতলজাত জলে প্লাস্টিকের ঘনত্ব অনেক বেশি পাওয়া গেছে।

- **ন্যানোপ্লাস্টিকের অনুপ্রবেশ:** ন্যানোপ্লাস্টিক অত্যন্ত বিপজ্জনক কারণ এগুলো কোষের পর্দা, রক্ত-মস্তিষ্কের প্রতিবন্ধক (Blood-brain barrier) এবং গর্ভফুল (Placenta) অতিক্রম করে মানব সংবহনতন্ত্র ও গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গে প্রবেশ করতে পারে।
- **প্যাথোফিজিওলজিক্যাল প্রভাব:** এই কণাগুলো **অক্সিডেটিভ স্ট্রেস**, দীর্ঘস্থায়ী প্রদাহ এবং কোষের ক্ষতি করে। এছাড়া এগুলো 'ট্রোজান হর্স' হিসেবে কাজ করে শরীরে ভারী ধাতু ও জীবাণু বহন করে আনে।
- **রাসায়নিক লিচিং (Leaching):** থ্যালেটস, **বিসফেনল এ (BPA)** এবং অ্যান্টিমনির মতো উপাদান বোতল থেকে জলে মিশে যেতে পারে।
- **পরিবেশগত প্রভাব:** সরাসরি সূর্যের আলো এবং ভারতের গ্রীষ্মকালীন উচ্চ তাপমাত্রা প্লাস্টিকের রাসায়নিক ভাঙন ও লিচিংয়ের হারকে ত্বরান্বিত করে।
- **দীর্ঘস্থায়ী বিষক্রিয়া:** লিচ হওয়া এই রাসায়নিকগুলো **এন্ডোক্রাইন ডিসরাপ্টর** (হরমোন ব্যঘতকারী) হিসেবে কাজ করে, যা প্রজনন বা বিকাশে দীর্ঘমেয়াদী সমস্যা তৈরি করতে পারে।
- **নিয়ন্ত্রণমূলক সীমাবদ্ধতা:** বর্তমান মানদণ্ডে মাইক্রোপ্লাস্টিকের সাথে একাধিক রাসায়নিকের দীর্ঘমেয়াদী বিক্রিয়া বা **'ককটেল ইফেক্ট'** মূল্যায়নের ব্যবস্থা নেই।

প্যাকেজজাত জল শিল্পের মূল সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ

- **ভূগর্ভস্থ জলের অতি-উত্তোলন:** এই শিল্প এমন সব জলস্তরের (Aquifers) ওপর নির্ভরশীল যা ইতিমধ্যেই সংকটাপন্ন। বৃষ্টির জল সংরক্ষণের মতো পুনর্ভরণ পদ্ধতিতে এদের বিনিয়োগ অত্যন্ত নগণ্য।
- **খনিজ ঘাটতির ঝুঁকি: রিভার্স অসমোসিস (RO)** প্রক্রিয়ায় ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়ামের মতো অত্যাবশ্যকীয় খনিজ দূর হয়ে যায়, যা হৃদরোগসহ দীর্ঘমেয়াদী স্বাস্থ্যঝুঁকি তৈরি করতে পারে (WHO-এর সতর্কতা অনুযায়ী)।
- **পরিবেশগত প্রভাব:** একবার ব্যবহারযোগ্য (Single-use) PET বোতল ভারতের প্লাস্টিক বর্জ্য সংকটকে ঘনীভূত করছে; যার মাত্র **১৩% কার্যকরভাবে রিসাইকেল** হয়। বাকি অংশ মাটি ও খাদ্যশৃঙ্খলে মিশে বাস্তুতন্ত্রের ক্ষতি করছে।
- **তথ্যের অসামঞ্জস্যতা:** গ্রাহকরা প্রায়ই 'ন্যাচারাল মিনারেল ওয়াটার' এবং সাধারণ 'প্যাকেজড ড্রিঙ্কিং ওয়াটার'-এর মধ্যে পার্থক্য করতে পারেন না, যা সচেতন সিদ্ধান্ত গ্রহণের পথে বাধা।

নিয়ন্ত্রণমূলক কাঠামো এবং প্রধান ঘাটতিসমূহ

ভারতের প্যাকেজজাত জল শিল্প বর্তমানে **FSSAI**-এর অধীনে একটি বড় পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে।

- **২০২৪-এর পরিবর্তন:** লাইসেন্সিং প্রক্রিয়া সহজ করতে FSSAI বাধ্যতামূলক **BIS শংসাপত্র** সরিয়ে নিয়েছে। এখন বোতলজাত জলকে **"উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ খাদ্য বিভাগ"** হিসেবে গণ্য করা হয়, যার জন্য বার্ষিক থার্ড-পার্টি অডিট বাধ্যতামূলক।
- **পরীক্ষাগারের সীমাবদ্ধতা (IS 14543):** বর্তমান মানদণ্ডে খনিজ ও ভারী ধাতু পরীক্ষার ব্যবস্থা থাকলেও, **মাইক্রোপ্লাস্টিক বা ন্যানোপ্লাস্টিক** পরীক্ষার কোনো প্রোটোকল নেই।
- **তদারকি ঘাটতি:** ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদনকারী ইউনিটগুলোতে প্রায়ই **কীটনাশকের অবশিষ্টাংশ** এবং **ফ্লোরাইড** দূষণ ধরা পড়ছে, যা নিয়ম পালনে উদাসীনতা প্রমাণ করে।

নিরাপদ জল ও প্লাস্টিক ব্যবস্থাপনায় সরকারি উদ্যোগ

১. জল জীবন মিশন (JJM): পরিকাঠামো ও সুবিধা

২০১৯ সালে শুরু হওয়া এই মিশনের লক্ষ্য প্রতিটি গ্রামীণ পরিবারে ট্যাপের মাধ্যমে জল পৌঁছে দেওয়া (২০২৬ পর্যন্ত বর্ধিত লক্ষ্যমাত্রা)।

- **২০২৬-এর অগ্রগতি:** ১৯.৩৬ কোটি গ্রামীণ পরিবারের মধ্যে ১৫.৮ কোটিরও বেশি (৮১.৬%) পরিবারে ট্যাপ সংযোগ দেওয়া হয়েছে।

- **গুণমান নজরদারি:** ২,৮০০টিরও বেশি ল্যাবরেটরি স্থাপন এবং ২৪ লক্ষেরও বেশি নারীকে **ফিল্ড টেস্টিং কিট (FTK)** ব্যবহারের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।
- **উৎসের স্থায়িত্ব:** ভূগর্ভস্থ জল পুনর্ভরণ এবং বৃষ্টির জল সংরক্ষণের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।

২. অমৃত (AMRUT) ২.০: নগর জল নিরাপত্তা

শহরগুলোকে **"জল-সুরক্ষিত"** (Water secure) করে তোলাই এর মূল লক্ষ্য।

- **সর্বজনীন কভারেজ:** ৪,৭০০টিরও বেশি সংবিধিবদ্ধ শহরে ১০০% জল সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্য।
- **বৃত্তাকার অর্থনীতি:** ব্যবহৃত জল পুনর্ব্যবহার (Recycle/Reuse) এবং জলাশয় সংস্কারের মাধ্যমে ভূগর্ভস্থ জলের ওপর চাপ কমানো।

৩. FSSAI-এর নতুন টেস্টিং স্কিম (২০২৬)

২০২৪-এ BIS শংসাপত্র সরানোর পর, ১ জানুয়ারি ২০২৬ থেকে আরও কঠোর তদারকি ব্যবস্থা চালু হয়েছে।

- **বাধ্যতামূলক পরীক্ষা:** উৎপাদকদের প্রতি মাসে অণুজীব পরীক্ষা এবং প্রতি তিন মাস অন্তর ভারী ধাতু ও খনিজ পরীক্ষা করতে হবে।
- **ডিজিটাল রেকর্ড:** 'ফুড বিজনেস অপারেটর'দের (FBO) ৫ বছরের ডিজিটাল পরিদর্শন রেকর্ড রাখা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

৪. মাইক্রোপ্লাস্টিক মোকাবিলা: প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিয়ম

২০২৪ ও ২০২৫ সালের সংশোধিত নিয়মগুলি সরাসরি মাইক্রোপ্লাস্টিক দূষণকে লক্ষ্য করে তৈরি।

- **মাইক্রোপ্লাস্টিকের সংজ্ঞা:** ২০২৪-এর নিয়মে প্রথমবারের মতো মাইক্রোপ্লাস্টিককে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে।
- **EPR (Extended Producer Responsibility):** উৎপাদক ও ব্র্যান্ড মালিকরা তাদের উৎপাদিত প্লাস্টিক বর্জ্য সংগ্রহ ও রিসাইকেল করতে আইনত বাধ্য।
- **ডিজিটাল ট্র্যাকিং (২০২৫):** উৎপাদন থেকে বর্জ্য অপসারণ পর্যন্ত নজরদারি চালাতে প্লাস্টিক প্যাকেজিংয়ে **QR কোড বা বারকোড** বাধ্যতামূলক।
- **SUP নিষিদ্ধকরণ:** একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক (Single-use Plastic) নিষিদ্ধ রাখা হয়েছে যাতে তা ভেঙে মাইক্রোপ্লাস্টিকে পরিণত না হয়।

ভবিষ্যতের পন্থা: একটি বহুমুখী কৌশল

এই "অদৃশ্য সংকট" মোকাবিলায় সমন্বিত নীতি সংস্কার, প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন এবং আচরণের পরিবর্তন প্রয়োজন, যা ভারতের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

- **নিরাপত্তার মানদণ্ড আধুনিকীকরণ:** মাইক্রোপ্লাস্টিক, প্লাস্টিকাইজার (যেমন- থ্যালেটস) এবং ভারী ধাতু পরীক্ষার জন্য **FSSAI প্রোটোকল** বাধ্যতামূলক করা এবং স্বচ্ছতা বজায় রাখতে পাবলিক ড্যাশবোর্ডের মাধ্যমে রিয়েল-টাইম তথ্য প্রকাশ করা।
- **পুরসভার জল সরবরাহ শক্তিশালী করা:** 'জল জীবন মিশন'-এর মতো উদ্যোগের মাধ্যমে ট্যাপের জলের ওপর আস্থা ফিরিয়ে আনা। এক্ষেত্রে পরিকাঠামো উন্নয়ন, থার্ড-পার্টি অডিট এবং গুণমান প্রকাশের জন্য অ্যাপ ব্যবহারের ওপর জোর দিতে হবে যাতে বোতলজাত জলের ওপর নির্ভরতা কমে।
- **টেকসই বিকল্পের প্রসার:** ভর্তুকি এবং সচেতনতা অভিযানের মাধ্যমে বাড়িতে ব্যবহারের উপযোগী ফিল্টার (যেমন- UF+UV সিস্টেম) এবং কাঁচ বা স্টেইনলেস স্টিলের পুনর্ব্যবহারযোগ্য পাত্রের ব্যবহার উৎসাহিত করা।
- **বৃত্তাকার অর্থনীতি (Circular Economy) ত্বরান্বিত করা:** প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিয়ম, ২০২২-এর অধীনে **Extended Producer Responsibility (EPR)** কঠোরভাবে প্রয়োগ করা, যাতে ১০০% PET বোতল সংগ্রহ, বাছাই এবং উচ্চমানের রিসাইক্লিং নিশ্চিত করা যায়।

উপসংহার

ভারতে বোতলজাত জলের ওপর এই নির্ভরতা মূলত জনপরিষেবার ঘাটতির একটি জটিল লক্ষণ। যদিও এটি সাময়িকভাবে জলের চাহিদা মেটায়, কিন্তু এর প্রচ্ছন্ন খরচ—মাইক্রোপ্লাস্টিক গ্রহণ থেকে শুরু করে ভূগর্ভস্থ জলের স্তর হ্রাস—প্রমাণ করে যে বর্তমান মডেলটি **টেকসই নয়**। ভারতের জন্য **টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ৬** (বিশুদ্ধ জল ও স্যানিটেশন) অর্জন করতে হলে বাণিজ্যিক সুবিধার চেয়ে একটি স্বচ্ছ এবং বিজ্ঞানসম্মত নিয়ন্ত্রক কাঠামোর ওপর বেশি গুরুত্ব দিতে হবে, যা নাগরিক এবং পরিবেশ—উভয়েরই দীর্ঘমেয়াদী স্বাস্থ্যকে অগ্রাধিকার দেবে।

নিচে আপনার দেওয়া টেক্সটটির একটি যথাযথ এবং মার্জিত বাংলা অনুবাদ দেওয়া হলো:

প্রশ্ন: *ভারতে বোতলজাত জলের ব্যবহারের দ্রুত বৃদ্ধি 'নিরাপত্তার ধারণা' এবং 'উদ্যমান স্বাস্থ্য ও পরিবেশগত ঝুঁকি'র মধ্যে এক কঠিন আপসকে তুলে ধরে। প্যাকেজজাত পানীয় জল শিল্পের চ্যালেঞ্জগুলি সমালোচনামূলকভাবে বিশ্লেষণ করুন। সকলের জন্য পানীয় জলের টেকসই এবং নিরাপদ অ্যাক্সেস নিশ্চিত করতে একটি বহুমুখী (Multi-sectoral) কৌশলের পরামর্শ দিন। (২৫০ শব্দ)*

***

Scan to know more about our courses...

IAS 2-Year GS PCM | **IAS 10-Month GS PCM** | **Degree + IAS** | **Prelims Test Series**